দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ

গাজী শরীফা ইয়াছমিন

পাঁচ বছরের অরুণিমা। রিপন সাহেবের ছোট্ট মেয়ে। ইদানীং স্কুলে সে শব্দ বানান করে পড়তে শিখছে। এক শুক্রবার পত্রিকায় "দুর্নীতি" শব্দটি পড়ে বাবার কাছে জানতে চায় এর অর্থ কি। রিপন সাহেব একই সাথে অবাক ও অপ্রস্তুত হন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবেন 'দুর্নীতি' শব্দটি কাজে ও ব্যাপকতায় এত গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে যে এর উপস্থিতি ও প্রভাব সম্পর্কে কোনো ধরনের প্রশ্নের অবকাশ নেই।

বর্তমান সময়ে দুর্নীতি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তা দৈনন্দিন জীবনের অংশ। কিন্তু দুর্নীতিকে কখনোই স্বাভাবিক হতে দেওয়া যাবে না। এজন্য আমাদের দুর্নীতির পরিভাষা ও মাত্রা নির্ধারণ করার নিরিখ বিশ্লেষণ করতে হবে। সাধারণ অর্থে যে কোনো নীতি-বিগর্হিত কাজকেই দুর্নীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে নীতি অর্থ সদর্থক মূল্যবোধ, যা একমাত্র বিবেকের কাছেই দায়বদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই বিবেকনির্ভর মূল্যবোধ সমাজকে ধারণ করছে। আর এখানেই 'অপরাধ' (Crime) ও 'দুর্নীতি'র (Corruption) মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য। অপরাধের জন্য দেশে আইন রয়েছে। অপরাধীকে আইনের সাহায্যে আদালত দন্ড দেন। কিন্তু দুর্নীতি সরাসরি আইনের বিরোধীতা করে না। এটি ঘাতক ব্যাধির মতো নিঃশব্দে সমাজের ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। এটি অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হয় যা অনেকসময় বাইরে থেকে অনুভব করা যায় না।

দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।"

আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হচ্ছে এবং দিনে দিনে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই উন্নতির সুফল জনগণের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়েছে। চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন ও দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল দলিল হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবার চরিত্র নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহু আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, ও প্রতিরোধ করতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়েছে। এটি ২০০৪ সালের ৯ মে এর দুর্নীতি দমন আইন অনুসারে কার্যকর হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে দুদকের ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে দুদক ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে। কমিশনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে বেশকিছু কৌশলগত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। কিছু মূল উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রসারিত করা। এছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় দুদক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ১৭ ধারা অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রতিরোধ, গবেষণা এবং গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই কাজটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই করা হয় এবং এটি দুর্নীতি প্রতিরোধ অঙ্গীকার পূরণে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। কার্যক্রমগুলোর মধ্যে জনগণকে সচেতন করা, দুর্নীতির খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা, সততা সংঘ গঠন এবং তার কর্মকান্ড পরিচালনা অন্যতম। প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কর্মকৌশলগুলো প্রধানত নেওয়া হয় তা হলো- নৈতিকতা, আচরণবিধি চালুকরণ; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি; দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্যান্য পদক্ষেপ; দুর্নীতির ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন। এই সমস্ত উদ্যোগগুলো দুদক আইন ২০০৪ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২ মোতাবেক করা হয়ে থাকে।

বিগত বছরগুলোতে দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯, চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ইত্যাদি। এসব আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনি ইশতেহারের 'দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছে এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতেই এগিয়ে চলছে। অর্থাৎ, দুর্নীতিকারী যেই হোক না কেনো, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে, তার কোনো ছাড় নেই। এর প্রমাণ আমরা করোনাকালে পেয়েছি। করোনা সংকট শুরুর পর থেকে, বিশেষ করে

স্বাস্থ্যখাতে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। দেশের কয়েকটি স্থানে ত্রাণ বিতরণের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যেনো না ঘটে এজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে।

সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরি। এই কঠিন লক্ষ্য সফল করার জন্য মানুষের জীবনের একেবারে গোড়া থেকে, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে। যদি সমন্বিতভাবে দুর্নীতির কদর্য চেহারাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং জনস্বার্থে এর কুফল সম্পর্কে তথা জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। দুর্নীতির অভিযানকে সফল করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ-উদ্যমকে একযোগে কাজে লাগাতে হবে। কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়। এর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

#

পিআইডি ফিচার